Written by Firoz Mahboob Kamal
Tuesday, 17 August 2010 12:11 - Last Updated Tuesday, 17 August 2010 12:18

বাংলাদেশে অপরাধীদের বিচরণ শুধু সন্ত্রাস, চুরিডাকাতি, খুণ-খারাবী বা ব্যভিচারীতে নয়, বরং পুলিশ, প্রশাসন, আদালত, ব্যবসা-বানিজ্য ও বুদ্ধিবৃত্তিসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে। বস্তুতঃ সমগ্র দেশটিই অধিকৃত তাদের হাতে। তাদের সবচেয়ে বড় ভীড় দেশের রাজনীতিতে। অনেকের কাছেই রাজনীতি এখন আর নিছক নিঃস্বার্থ জনসেবার হাতিয়ার নয়, ব্যবহৃত হচ্ছে হীন স্বার্থ শিকারে। হিংস্র জীব যেমন শিকার শেষে বনে গিয়ে আশ্রয় নেয়, তেমনি বহু দুর্বৃত্ত অপরাধীরাও নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে বা কৃত অপরাধের শাস্তি এড়াতে রাজনীতিতে যোগ দেয়। অফিস-আদালত, সেনানিবাস, হাট-বাজার বা লোকালয়ে অপরাধ কর্ম সংঘটিত হলে সেটির তবুও বিচারের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু রাজনীতিতে সে সম্ভাবনা নেই। কারণ, আদালত, সেক্রেটারিয়েটে, ডাকাতপাড়া বা পথে ঘাটে দুষ্কর্মে লিপ্ত কোন অপরাধীকে পুলিশ ধরলে তার পক্ষে মিছিল হয় না, লগি বৈঠা নিয়ে তাকে বাঁচাতে কেউ যুদ্ধ শুরু করে না। অথচ কোন রাজনৈতিক নেতাকে দুর্নীতি বা কোন বিদেশী শক্তির গুপ্তচর বা এজেন্ট হওয়ার গুরুতর অভিযোগে ধরলেও তার বিচার করা অসম্ভব। বিচারের আগেই অপরাধী নেতাকে নির্দোষ ঘোষনা দেওয়া হয় রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে। এবং সে নেতার বিরুদ্ধে বিচারের যে কোন উদ্যোগকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা আখ্যা দিয়ে সরকার ও বিচারকদেরই উল্টো রাজপথে লাঠি দেখানো হয়। পাকিস্তান আমলে তাই শেখ মুজিব এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর সাথীদের বিচার করা সম্ভব হয়নি। অথচ অভিযুক্তরা যে ভারতের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করেছিল তা নিয়ে এখন আর বিতর্ক নেই। বরং সে ষড়যন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্টতা এখন গণ্য হচ্ছে আত্ম-গরিমার বিষয় রূপে। অথচ দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে শত্রু দেশের সাথে মিলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া যে কোন সভ্য দেশেই মৃত্যুদন্ড বা যাবৎ জীবন কারদন্ড হওয়ার মত মারাত্মক অপরাধ। বাংলাদেশের বহু লোকের কাছে আগরতলা ষড়যন্ত্রটি যত গৌরবময় কর্ম রূপেই গণ্য হোক না কেন, পাকিস্তান সরকারের কাছে সেটি ছিল দেশদ্রোহ-মূলক জঘন্য অপরাধ। ভারত বা অন্য যে কোন দেশে এরূপ ষড়যন্ত্র হলে সেখানেও এটাকে ভিন্ন ভাবে দেখা হত না। কিন্তু পাকিস্তান সরকার সে অপরাধের বিচার করতে পারেনি। পাকিস্তানের আদালত শেখ মুজিবকে কাঠগড়ায় তুলেছিল ঠিকই কিন্তু বিচারের কাজ শেষ করতে পারেনি। আগরতলা ষড়যন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্টতা শেখ মুজিবকে কোন শাস্তি দেওয়া দূরে থাক, সেটিই তাকে হিরো বানিয়ে দেয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে অপরাধ কর্মের নায়কও যে কতটা বিশাল প্রতিষ্ঠা পায় এ হল তার নজির। আর এরূপ প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তরাই দেশের ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতিকে অপরাধীদের অভয় অরণ্যে পরিণত করেছে।

অর্থহরণ, নারীহরণ, দস্যুবৃত্তি ও দেশের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি যে কোন সমাজেই জঘন্য অপরাধ। তবে বড় অপরাধ হল, জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকারের ন্যায় মৌলিক মানবিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া। এতে লুন্ঠিত হয় মানুষের মানবিক পরিচিতি ও মর্যাদা। ব্যক্তির জীবনে অতি মূল্যবান সম্পদ এটি। এ অধিকার অর্জনে রাষ্ট্রে বিশাল বিপ্লব আনতে হয়। মানুষ উপার্জন বাড়ায়, উন্নত সমাজ গড়ে এবং সভ্য রাষ্ট্র নির্মান করে তো সে মানবিক মর্যাদা বা অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে। মানবতার মূল শত্রু হল তারাই যারা মানুষের স্বাধীন মানুষ রূপে মানুষের বাঁচার সে অধিকারই ছিনিয়ে নেয়। যে কোন সভ্যদেশে সামরিক ক্যু ও সরকার বিরোধীদের রাজনৈতিক অধিকার হনন এ জন্যই অতি গুরুতর অপরাধ। এতে সভ্য সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মানের মূল লক্ষ্যই ব্যহত হয়ে যায়। দেশ তখন পরিণত হয় কারাগারে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতি অপরাধীদের অভয় অরণ্য হওয়ায় এমন অপরাধ কোন অপরাধই নয়। শেখ মুজিব গণতন্ত্র হরণ করেছেন, সকল বিরোধী দলকে নিষিদ্ধ করেছেন, সকল সরকার-বিরোধী পত্রিকার দফতরে তালা ঝুলিয়েছেন। তার আমলে নিহত হয়েছে প্রায় ৩০ হাজারের বেশী বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক কর্মী। কোন কোন হত্যার পর প্রচন্ড দম্ভ দেখিয়েছেন শেখ মুজিব স্বয়ং নিজে। এমন কুরুচি সচিারাচর কোন সভ্য মানুষের থাকে না। অথচ বন্দী সিরাজ সিকদারকে পুলিশি হেফাজতে হত্যা করার পর পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে "কোথায় আজ সিরাজ সিকদার?" বলে উল্লাস করেছেন। কাউকে বিনাবিচারে হত্যা করার অধিকার কোন সরকারেরই থাকে না। শেখ মুজিবেরও ছিল না। কিন্ত্র আওয়ামী লীগ শাসনামলে শুধু সিরাজ সিকদারকেই কারাধীন অবস্থায় হত্যা করা হয়নি, প্রাণ হারিয়েছেন মুসলিম লীগ সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরী। নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে নেজামে ইসলামী নেতা মৌলভী ফরিদ আহম্মদসহ আরো অনেককেই।

অপরাধ কর্ম প্রতিসভ্য বা অসভ্য সব সমাজেই ঘটে। তবে সভ্য সমাজের বৈশিষ্ঠ হল সে সমাজে অপরাধের বিচার হয়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পায়। অথচ অসভ্য সমাজে সেটি হয় না। এভাবেই ফুটে উঠে সভ্য সমাজ থেকে অসভ্য সমাজের পার্থক্য। অপরাধীর বিচারে সর্বপ্রথম যেটি জরুরী, সেটি হল অপরাধকে ঘৃণা করা সামর্থ। এবং সে সাথে অপরাধীকে নিছক অপরাধী হিসাবে দেখা। বিচারের আগে কে কোন দলের, কে কোন ভাষা বা বর্ণের অপরাধীর সে পরিচয়টি গুরুত্ব পেলে সুবিচারই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই সুবিচারের সামর্থ সবার থাকে না। এ জন্য চাই মানসিক, চারিত্রিক ও নৈতিক সুস্থ্যতা। স্বৈরাচারি শাসক, দুর্বৃত্ত বিচাররক, আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিক লুটেরোদের সে সামর্থ থাকে না। তারা তো নিজেরাই ঘৃন্য অপরাধের নায়ক। তারা বরং ন্যয় বিচারকেই অসম্ভব করে তোলে। এরা শুধু প্রশাসন ও

রাজনীতিকেই দখলে নেয় না, দখলে নেয় দেশের আদালতকেও। তাদের অন্যায় কর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষকেই তারা রাজনৈতিক শত্রু জ্ঞান করে এবং বিচার ছাড়াই তাদের হত্যা করে। সে হত্যাকে জায়েজ করার জন্য তারা বড় জোর মেঠো আদালত বসায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদীরা সে দেশের কালো ও রেড ইন্ডিয়ানদের নির্মূলকে জায়েজ করার জন্য সেদেশে বহু হাজার মেঠো আদালত বসিয়েছে। একই মানসিকতার কারণে বাংলার মসলিন শিল্পের তাঁতীরা ঔপনিবেশিক ইংরেজদের কাছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য হয়েছে। তাদের সে অপরাধে হাতের আঙ্গুলও কাটা হয়েছে। দেশের শাসনক্ষমতা অপরাধীদের হাতে গেলে ন্যায় বিচার যে কতটা অসম্ভব হয়ে পড়ে এ হল তার সামান্য নমুনা।

একই রূপ অবস্থা শেখ মুজিব ও তার অনুসারি আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী-বুদ্ধিজীবীদের। আওয়ামী লীগ তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে সুবিচার প্রতিষ্ঠার বদলে সর্বপ্রথম তার নিজ দলের শত শত নেতা-কর্মীদের উপর থেকে দায়েরকৃত মামলা তুলে নিয়েছে। এর মধ্যে বহু খুনের মামলাও রয়েছে। অথচ যে কোন দেশে কাউকে নির্দোষ বলে খালাস দেওয়ার সামর্থ কোন সরকারের থাকে না। সে অধিকার একমাত্র আদালতের। সে সাথে মামলার বন্যা শুরু হয়েছে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। একই রূপ ঘটনা ঘটেছে সত্তরের দশকে আওয়ামী শাসনামলে। বহু হাজার বিহারী, হাজার হাজার রাজাকার , শত শত আলেম ও বহু হাজার বামপন্থি কর্মীকে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়েছে। লুন্ঠিত হয়েছে তাদের ঘরবাড়িও সহায়সম্পদ। লুন্ঠিত হয়েছে রিলিফের মাল। অপরাধ কর্মের প্রচন্ড প্লাবন শুরু হয়েছিল মুজিব আমলে। কিন্তু শেখ মুজিব ও তাঁর স্বৈরাচারি সরকার অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থাই নেয়নি।

শেখ মুজিব: “ঢাকা স্টেডিয়ামে কোন ম্যাসাকার হয়নি। তুমি মিথ্যে বলছ।”ফালাসী: “ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত ঘটনাটি?”শেখ মুজিব: “ম্যাসাকার? হোয়াট ম্যাসাকার?”হাজার হাজার মানুষের সামনে ঢাকা স্টেডিয়ামে কাদের সিদ্দিকী ৪ জন হাতপা বাঁধা রাজাকার হত্যা করেছে। আন্তর্জাতিক আইনে এভাবে বন্দীদের হত্যা যুদ্ধাপরাধ। কিন্তু আওয়ামী লীগ সে জঘন্য অপরাধটিকেও অপরাধ রূপে গণ্য করেনি। শেখ মুজিব সে অপরাধ কর্মকে প্রথমে অস্বীকার করেন, তারপর নিহতরা যেহেতু রাজাকার সেহেতু সেটিকে জায়েজ ঘোষনা দেন। এ বিষয়ে প্রামাণ্য দলীল এসেছে প্রখ্যাত সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাসীর রিপোর্ট থেকে। তিনি লিখেছেন, “এরপর ১৮ই ডিসেম্বর হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি রাগে ফেটে পড়েন। নিচের অংশটি আমার টেপ থেকে নেয়া। ফালাসী: “মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমি মিথ্যাবাদী নই। সেখানে আরো সাংবাদিক ও প্রায় পনের হাজার লোকের সাথে আমি হত্যাকান্ড প্রত্যক্ষ করেছি। আমি চাইলে আমি আপনাকে তার ছবিও দেখাবো। আমার পত্রিকায় সে ছবি প্রকাশিত হয়েছে।”শেখ মুজিব: “মিথ্যাবাদী, ওরা মুক্তিবাহিনী নয়।”ফালাসী: “মি. প্রাইম মিনিস্টার, দয়া করে মিথ্যাবাদী শব্দটি আর উচ্চারণ করবেন না। তারা মুক্তিবাহিনী। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আব্দুল কাদের সিদ্দিকী এবং তারা ইউনিফর্ম পরা ছিল।”শেখ মুজিব: “তাহলে হয়তো ওরা রাজাকার ছিল যারা প্রতিরোধের বিরোধীতা করছিল এবং কাদের সিদ্দিকী তাদের নির্মূল করতে বাধ্য হয়েছে।”ফালাসী: “মি. প্রাইম মিনিস্টার, ..কেউই প্রতিরোধের বিরোধীতা করেনি। তারা ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। হাত পা বাঁধা থাকায় তারা নড়াচড়াও করতে পারছিল না।”শেখ মুজিব: “মিথ্যেবাদী।”ফালাসী: “শেষ বারের মতো বলছি, আমাকে মিথ্যেবাদী বলার অনুমতি আপনাকে দেবো না।” (ইন্টারভিউ উইথ হিস্টরী, ওরিয়ানী ফালাসী। - অনুবাদে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু)। এই হল শেখ মুজিবের মানসিকতা। এই হল আওয়ামী লীগ ঘোষিত সর্বকালের সেরা বাঙালীর মানবতা, নৈতিকতা, ন্যায়-অন্যায়বোধ ও চরিত্রের মান। তবে এটি শুধু শেখ মুজিবের একার মানসিকতা নয়, এ হল শেখ হাসিনাসহ সকল আওয়ামী নেতাকর্মীদের আসল রূপ। এরই ফল হল, যে অপরাধটি শুধু ওরিয়ানা ফালাসীর একার দৃষ্টিতে নয়, সমগ্র বিশ্বের বিবেকমান মানুষের দৃষ্টিতে ছিল জঘন্য যুদ্ধাপরাধ -তা শেখ মুজিবের কাছে আদৌ অপরাধ গণ্য হয়নি। বরং গণ্য হয়েছে বীরত্বপূর্ণ কর্ম রূপে। এমন মানসিকতা নিয়ে বিনা বিচারে মানুষ হত্যাকে জায়েজ মনে করা যেতে পারে, কিন্তু সে মানসিকতা নিয়ে কি ন্যায় বিচারও প্রতিষ্ঠা করা যায়?

যে কোন অপরাধের ন্যায় যুদ্ধাপরাধের ন্যায্য বিচারে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু তা নিয়ে আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের আদৌ কোন আগ্রহ ও যোগ্যতা আছে কি? আওয়ামী লীগ এর আগেও দুইবার ক্ষমতায় এসেছে। আগ্রহ থাকলে সে বিচার সত্তরের দশকেই মুজিব আমলে হত। অপরাধের আলামত ৪০ বছর পর অক্ষত থাকার কথা নয়। যে কোন যুদ্ধে দুইটি পক্ষ থাকে। প্রতিপক্ষেই কিছু অপরাধী লোকও থাকে। তারাই অপরাধ ঘটায়। বহু নিরপরাধ লোক তখন মারা যায়। সুবিচারে আগ্রহী হলে উভয় পক্ষের অপরাধীদেরই আদালতের কাঠগড়ায় তুলতে হয়। একাত্তরের সকল অপরাধ শুধু পাকিস্তানী সেনাবাহিনী করেছে সেটি ঠিক নয়। তা হলে হাজার হাজার বিহারীদের কারা হত্যা করল? কারাই বা বহু হাজার বন্দী রাজকার এবং হাজার হাজার পাকিস্তানপন্থি নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করল? তারা নিশ্চয় বজ্রপাতে বা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারা যায়নি। কারাই বা তাদের ঘরবাড়ি লুন্ঠন করল? বসনিয়া ও কসভোর যুদ্ধে বহু অপরাধ সংঘটিত

Written by Firoz Mahboob Kamal
Tuesday, 17 August 2010 12:11 - Last Updated Tuesday, 17 August 2010 12:18

হয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালত সার্ব ও মুসলিম এ উভয় পক্ষের অপরাধীদের বিরুদ্ধে বিচারের ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে সেটি কই? বিচারের এই কি আন্তর্জাতিক মান? আন্তর্জাতিক আইনে যে কোন বন্দীকে হত্যা করা যুদ্ধাপরাধ। কিন্তু বিচারের নামে এ প্রহসনে বন্দী হত্যাকারিদের বিচারের কোন উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে শুধু সরকার-বিরোধীদের বিচারের উদ্যোগ নিচ্ছে। বহু মানুষকে তারা সে উদ্দেশ্যে গ্রেফতারও করেছে। কিন্তু যেসব যুদ্ধাপরধারীরা আওয়ামী লীগে আশ্রয় নিয়েছে তাদের বিচারের উদ্যোগ কই? কাউকে বিচার করতে হলে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রমাণ আনতে হয়। কথা হল, যাদেরকে গ্রেফতার করা হল তাদের বিরুদ্ধে কি এমন ছবিসহ প্রমাণ আছে যে তারা রাইফেলের মাথায় বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মানুষ হত্যা করছে? থাকলে সরকারের সে ছবি প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু কাদের সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে সে ছবি আছে। বিদেশী পত্রিকায় সে ছবি ছাপা হয়েছে। সে ছবি বহু ওয়েব সাইটে এখন প্রামাণ্য দলীল রূপে শোভা পায়। ফলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে আওয়ামী লীগ সরকারের সামান্যতম আগ্রহ থাকলে সে বিচার কাদের সিদ্দিকীকে দিয়ে শুরু হওয়া উচিত ছিল।

আন্তর্জাতিক আইনে কাউকে জোরপূর্বক ঘর থেকে রাস্তায় নামিয়ে তার ঘর-বাড়ি ও সহায়-সম্পদ দখলে নেওয়া অপরাধ। যুদ্ধকালে ঘটলে সেটি ভয়ানক যুদ্ধাপরাধ। বাংলাদেশে সে অপরাধ যে কতটা বীভৎস ভাবে হয়েছে তার প্রমাণ হল, কয়েক লক্ষ বিহারীর হত্যাই শুধু নয়, তাদের সহায়-সম্বলহীন বস্তির জীবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর সে দেশে হিটলারের নাজী পার্টির বহু লক্ষ নেতা-কর্মী ছিল। কিন্তু বিজয়ী ব্যক্তিরা তাদের ক'জনের ঘরবাড়ী দখলে নিয়েছে? খুন বা ডাকাতি করলে আদালতে শাস্তি হয়, কিন্তু তাই বলে কি অপরাধীর ঘরবাড়ী ছিনিয়ে নিয়ে তার স্ত্রী শিশু পুত্র-কণ্যাকে রাস্তায় নামানো যায়? এটি কি অমানবিকতা ও অপরাধ নয়? বিশ্বের কোন সভ্যদেশে কি এমন বিধান আছে? কিন্তু আওয়ামী লীগের কাছে এ অপরাধ কোন অপরাধই গন্য হয়নি। তাই জঘন্য অপরাধীদেরকে তাদের অন্যায় ভাবে দখল করা বিহারীদের ঘরবাড়ীর মালিকানা দিয়ে তারা পুরস্কৃত করেছে। কথা হল, এই যাদের ন্যায়বোধ, মূল্যবোধ, বিচারবোধ ও মানবতার মান, তারা যুদ্ধাপরাধ দূরে থাক, কোন বিচারেরই কি সামর্থ রাখে? কারণ, সে জন্য তো ন্যায়কে ন্যায় এবং অন্যায়কে অন্যায়কে অন্যায় বলার সামর্থটুকু তো দরকার?

অপরাধ শুধু যুদ্ধকালে ঘটে না। যুদ্ধ ছাড়াও প্রতিদেশে বহু মানুষ খুন হয়, বহু নারী ধর্ষিত হয়, বহু দোকানপাঠ ও ঘরবাড়ি লুন্ঠিতও হয়। অন্যদেশের তুলনায় বাংলাদেশে সেটি বরং প্রতিদিন বেশী বেশী হয়। দেশটি যে অপরাধীদের কতবড় অভয় অরণ্য তার প্রমাণ, অপরাধ কর্মে বাংলাদেশ বিশ্বের ২০০টির বেশী রাষ্ট্রকে হারিয়ে ৫ বার বিশ্বে প্রথম হয়েছে। মুজিব আমলে হাজার হাজার কোটি টাকার রিলিফের মালামাল লুন্ঠিত হয়েছে। লুণ্ঠনে লুন্ঠনে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হয়া হয়েছে। বিশ্বের দরবারে তলাহীন ভিক্ষার ঝুলির খেতাবও পেয়েছে। যে জমিতে গাছের চেয়ে আগাছারই ভিড় বেশী সে জমিতে আগাছা তুলতে বেগ পেতে হয় না। প্রশ্ন হল, যেখানে এত অপরাধী, তাদের মধ্য থেকে ক'জনের বিচার হয়েছে? আওয়ামী লীগ তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর দুর্বৃত্তদের অপরাধ-কর্ম প্রতিবারের ন্যায় এবারও প্রচন্ড তীব্রতা পেয়েছে। তাদের দলীয় অপরাধীদের হাতে বেদখল হয়ে যাচ্ছে সরকারি খাস জমি, নদীর পাড়, রেলের জমি, বনভূমি, সমুদ্র সৈকত, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল। ডাকাতির শিকার হচ্ছে দেশের হাটবাজার। লুটপাঠ হয়ে যাচ্ছে রাস্তার পাশের সরকারি গাছ। অপরাধীদের বিচারে সরকারের সামান্যতম ইচ্ছা থাকলে এসব অপরাধকর্মের নায়কদের গ্রেফতার করা হত। তাদের আদালতে তোলা হত। কিন্তু মুজিব যেমন বিচার করেনি, তার কন্যা হাসিনাও করছে না। তাদের আগ্রহ অন্যত্র। তারা বরং এসব অপরাধীদের নিজ দলে স্থান করে দিচ্ছে। মুজিব আমলে শত শত এমন অপরাধীর মাঝে এক জঘন্য অপরাধী দুর্বৃত্ততে আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছিল। তার নাম গাজী গোলাম মোস্তাফা। সে ছিল ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির প্রধান। রিলিফের মাল লুটলাঠের মাধ্যমে সে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছিল। দেশী-বিদেশী পত্রিকায় তার কীর্তিকলাপের বহু বিবরণও ছাপা হয়েছিল। কিন্তু সে জন্য তাকে একদিনের জন্যও আদালতে যেতে হয়নি, কোন জেলে-জরিমানাও হয়নি। বরং সে সব সময়ই শেখ মুজিবের সমর্থণ পেয়েছে। ফলে কোন পুলিশ বা দূর্নীতি দমন বিভাগের কোন কর্মচারি তার কেশও স্পর্শ করতে পারেনি। আর এখন এমন গাজী গোলাম মোস্তাফার সংখ্যা আওয়ামী লীগে অসংখ্য।

আওয়ামী লীগ অপরাধীদের দ্বারা যে কতটা অধিকৃত, তাদের শাসনামলে অপরাধের জোয়ার যে কতটা তীব্রতা পায় এবং দলটির নেতৃবৃন্দ অপরাধীদের বিচার ও শাস্তির ব্যাপারে যে কতটা উদাসীন তার কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রথমে শেখ হাসিনার আমল থেকে। পরে তাঁর পিতার আমল থেকে। ১০ই আগষ্ট, ২০১০ তারিখে "দৈনিক আমার দেশ" নিম্নের খবরটি ছেপেছে, "কুয়াকাটার শত শত একর সরকারি খাস জমি দখল প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর এবার প্রভাবশালী দখলদারদের মূল টার্গেট কুয়াকাটা সৈকতের মূল বেলাভূমি। এরই মধ্যে সমুদ্রের বালুকাবেলার মূল সৈকতে পিলার পুঁতে পজিশন দখলে নিয়েছে

দখলদাররা। সমুদ্রের তীরঘেঁষে ওয়াটার লেভেলে এরিয়াজুড়ে তোলা হয়েছে অবৈধ স্থাপনা। সৈকত-লাগোয়া সরকারি খাস জমির ওপর ১৯৯৮ সালে ৫০ জেলে পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য যে আদর্শ গ্রাম করা হয়েছিল, সেই জায়গাটিও কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখে দখল করা হয়েছে। অথচ কোটি কোটি টাকার জমি উদ্ধার কিংবা অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য ভূমি প্রশাসন কিংবা বিচ ম্যানেজমেন্ট কমিটি কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। কুয়াকাটা ঘুরে দেখা গেছে, বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বিভিন্ন হাউজিং কোম্পানিসহ এলাকার প্রভাবশালীরা যেন খাস জমি দখলের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। গড়ে উঠছে একের পর এক অবৈধ স্থাপনা। এখন দেদার দখল করা হচ্ছে সৈকতের বেলাভূমি। পর্যটকরা যে বিচে হাঁটাচলা করতেন, সেসব স্থানও দখল করে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হচ্ছে।”

দেশের রাজনীতি অপরাধী চক্রের দ্বারা অধিকৃত হলে তখন শুধু প্রশাসনই দুর্বৃত্ত কবলিত হয় না, তাদের দখলে যায় সমগ্র দেশ। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল যে কতদ্রুত অপরাধীদের দখলে যাচ্ছে তারও কিছু সাম্প্রতিক উদাহরণ দেওয়া যাক। “দৈনিক আমার দেশ” ১০ই আগষ্ট, ২০১০ তারিখে খবর ছেপেছে, “কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় এ মাসে ৫টি খুন, ৩টি অপহরণসহ একাধিক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এখনও অপ্রতিরোধ্যভাবে চলছেই। এসব অপরাধ কর্মকাণ্ড ঘটলেও থানা পুলিশের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। দৌলতপুর থানার ওসির ভূমিকা নিয়েও জনমনে প্রশ্ন উঠছে। আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কারণে এ উপজেলার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। .. গত ৩রা জুলাই হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের দাড়েরপাড়া গ্রামের একটি পাট ক্ষেতে থেকে এ্যানি নামের এক শিশুকন্যার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। সন্ত্রাসীরা শিশুটিকে অপহরণের ৫ দিন পর মাটি খুঁড়ে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। ৬ জুলাই মাদক ব্যবসার অর্থ লেনদেনকে কেন্দ্র করে প্রাগপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামে দু’দল মাদক ব্যবসায়ীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়। এ সময় বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। একই দিন ফিলিপনগর ইউনিয়নের লালদহ মাঠে বুলবুল ইসলাম নামের এক ব্যবসায়ী সন্ত্রাসী হামলায় গুরুতর আহত হন। ৭ জুলাই সকালে হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের তারাগুনিয়া মণ্ডলপাড়া গ্রাম থেকে গৃহবধূ রঙ্গিলা খাতুনের লাশ উদ্ধার করা হয়। ৮ জুলাই উপজেলার চরাঞ্চলে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গ্রামবাসীর ওপর হামলা চালায় এবং গুলিবর্ষণ করে। এতে ১০ জন আহত হয়। ১৬ জুলাই রাতে গুলিবর্ষণ ও বোমা ফাটিয়ে আদাবাড়িয়া গ্রামের আলম হোসেনের ছেলে ব্যবসায়ী সুমনকে ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণের দাবিতে অপহরণ করে সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনার একদিন পর ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ওই ব্যবসায়ী ছাড়া পেলেও পুলিশ কোনো পদক্ষেপই নেয়নি বলে অপহৃতের পরিবারের অভিযোগ। একই দিন সকালে উপজেলার হোসেনাবাদ আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরিতে দু’দল শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলি হলেও পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা বা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ১৮ জুলাই উপজেলার সদর ইউনিয়নের লাউবাড়িয়া ও চুয়ামলিকপাড়া গ্রামের ৩ বাড়ি থেকে হালের বলদসহ ৬টি গরু লুটের ঘটনা ঘটে। ২৩ জুলাই মরিচা ইউনিয়নের দুর্গম নতুনচরে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ডাকাতরা ২ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। ২৪ জুলাই রাতে মরিচা ইউনিয়নের নতুনচর গ্রামে আসাদুল ইসলাম, শহিদুল, টিক্কা, বানেজ মণ্ডল, জহুরুল, ইব্রাহিম মণ্ডল ও আবদুল হান্নানের বাড়িতে গণডাকাতির ঘটনা ঘটে। ডাকাত দল এ সময় নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কারসহ ৫ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। ২৯ জুলাই রাতে কিশোরীনগর পূর্বপাড়া গ্রাম থেকে মোশারফ হোসেনের ছেলে মৎস্য খামারি মাজেদুলকে ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণের দাবিতে অপহরণ করে সন্ত্রাসীরা। ৩০ জুলাই সকালে খলিসাকুণ্ডি ইউনিয়নের পিপুলবাড়িয়া এলাকার একটি মাঠের ভেতর এখতিয়ার হোসেন খান নামের এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করা হয়। ৩১ জুলাই ইউএনও’র নির্দেশ অমান্য করে পুলিশের সামনেই দৌলতপুর উপজেলার প্রভাবশালী ভূমিদস্যু মোহাম্মদ আলী উপজেলা পরিষদের উত্তর পাশে মানিকদিয়াড় সরকারি প্রাইমারি স্কুলের জমি দখল করে প্রাচীর নির্মাণ করে। সরকারি স্কুলের জমিতে অবৈধভাবে প্রাচীর নির্মাণ করার এ ঘটনায় ভুক্তভোগী এলাকাবাসী ভূমিদস্যু মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠেন। ১ আগস্ট রিফায়েতপুর ইউনিয়নের ঝাউদিয়া নতুনপাড়া গ্রামে সাহারা খাতুন নামের স্বামী পরিত্যক্ত এক মহিলাকে কুপিয়ে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রাসীদের বাধা দিতে গিয়ে তাদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে পপি নামের এক কলেজছাত্রী গুরুতর আহত হয়। ৪ আগস্ট চকবলিগাথুয়া গ্রামের পটল ক্ষেতে থেকে চায়না খাতুন নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ হল শেখ হাসিনার আমলে অপরাধ দমন ও অপরাধীদের শাস্তির নজির।

এবারের উদাহরনটি শেখ হাসিনার পিতার আমল থেকে। ১৯৭৩ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের কিছু খবরের শিরোনাম ছিলঃ “ঝিনাইদহে এক সপ্তাহে আটটি গুপ্তহত্যা”(০১/০৭/৭৩); “ঢাকা-আরিচা সড়কঃ সূর্য ডুবিলেই ডাকাতের ভয়” (০২/০৭/৭৩) “বরিশালে থানা অস্ত্রশালা লুটঃ ৪ ব্যক্তি নিহত” (৪/০৭/৭৩); “পুলিশ ফাঁড়ি আক্রান্তঃ সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র লুট” (১২/০৭/৭৩); “লৌহজং থানা ও ব্যাংক লুট”(২৮/০৭/৭৩); “দুর্বৃত্তের ফ্রিস্টাইল” (০১/০৮/৭৩); “পুলিশ ফাঁড়ি ও বাজার লুটঃ লঞ্চ ও ট্রেনে ডাকাতি”(৩/০৮/৭৩); “এবার পাইকারীহারে ছিনতাইঃ সন্ধ্যা হইলেই শ্মশান”(১১/০৮/৭৩);“চট্টগ্রামে ব্যাংক

ডাকাত,লালদীঘিতে গ্রেনেডে চার্জে ১৮ জন আহত, পাথরঘাটায় রেঞ্জার অফিসারের অস্ত্র লুট" (১৫/০৮/৭৩); "খুন ডাকাতি রাহাজানিঃ নোয়াখালীর নিত্যকার ঘটনা,জনমনে ভীতি" (১৬/০৮/৭৩); "২০ মাসে জামালপুরে ১৬১৮টি ডাকাতি ও হত্যাকান্ড" (১৭/১১/৭৩); "আরও একটি পুলিশ ক্যাম্প লুটঃ সুবেদারসহ ৩ জন পুলিশ অপহৃত" (১৩/০৭/৭৩);"যশোরে বাজার লুটঃ দুর্বৃত্তদের গুলীতে ২০ জন আহত" (১৮/০৪/৭৪); "রাজশাহীতে ব্যাংক লুট" (২১/৪/৭৪)। এ হল মাত্র একটি পত্রিকার খবরের শিরোনাম। মুজিব আমলের পত্রিকাগুলো পড়লে চোখে পড়বে এরূপ হাজার হাজার ঘটনা ও বহু হাজার বিয়োগান্ত খবর। পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাসে দুর্বৃত্তির যত না ঘটনা ঘটেছে মুজিবের ৪ বছরে তার চেয়ে বহু গুণ বেশী ঘটেছে। বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসে "ভিক্ষার ঝুলী"-এ খেতাব জুটেনি, কিন্তু মুজিব সেটি অর্জন করেছেন। অথচ কিছু কাল আগেও গ্রামবাংলার অধিকাংশ মানুষের গৃহে কাঠের দরজা-জানালা ছিল না। ঘরের দরজায় চট বা চাটাই টানিয়ে অধিকাংশ মানুষ পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদে রাত কাটাতো। কিন্তু মুজিব শুধু খাদ্যই নয়,সে নিরাপত্তাটুকুও কেড়ে নেন। নিরাপত্তার খোঁজে তাদেরকে ঘর ছেড়ে বন-জঙ্গলে আশ্রয় খুঁজতে হয়। থানা পুলিশ কি নিরাপত্তা দিবে? তারা নিজেরাই সেদিন ভুগেছিল চরম নিরাপত্তাহীনতায়। দুর্বৃত্তদের হাতে তখন বহু থানা লুট হয়েছিল। বহু পুলিশ অপহৃত এবং নিহতও হয়েছিল। মুজিবের নিজের দলীয় কর্মীদের সাথে তার নিজের পুত্রও নেমেছিল দুর্বৃত্তিতে। সে সময় দৈনিক পত্রিকায় খবর ছাপা হয়েছিলঃ "স্পেশাল পুলিশের সাথে গুলী বিনিময়ঃ প্রধানমন্ত্রীর তনয়সহ ৫ জন আহত"। মূল খবরটির ছাপা হয়েছিল এভাবেঃ "গত শনিবার রাত সাড়ে এগারোটায় ঢাকার কমলাপুর স্পেশাল পুলিশের সাথে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে প্রধানমন্ত্রী তনয় শেখ কামাল,তার ৫ জন সাঙ্গপাঙ্গ ও একজন পুলিশ সার্জেন্ট গুলীবিদ্ধ হয়েছে। শেখ কামাল ও তার সঙ্গীদেরকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের নয়,দশ ও তেরশ নম্বর কেবিনে ভর্তি করা হয়েছে। আহত পুলিশ সার্জেন্ট জনাব শামীম কিবরিয়াকে ভর্তি করা হয় রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে।"-(গণকণ্ঠ ১৯/১২/৭৩)।

দিন বদল হলেও আওয়ামী লীগ যে বদলায় না এ হল তার উদাহরণ। এমন এক দুর্বৃত্তকবলিত দলটি যুদ্ধাপরাধের বিচার করবে সেটি কি আশা করা যায়? তা এক অলীক স্বপ্ন। যাদের কাছে অপরাধই অপরাধ নয়, তারা অপরাধীদের খুঁজে বের করবে কি করে? তাদের একমাত্র এজেন্ডা নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মূল করা। এবং সে নির্মূল প্রক্রিয়াকে জায়েজ করতে তারা প্রতিপক্ষকে অপরাধী রূপে চিত্রিত করতে চায় এবং গ্রেফতার করে আদালতে তুলতে চায়। তাই প্রকৃত অপরাধীদের দাপটে দেশবাসীর জীবনে অশান্তি বাড়লে কি হবে, পুলিশ ব্যস্ত মিথ্যা মামলা তৈরি করার কাজে। পুলিশের এখন এটিই সবচেয়ে বড় কাজ। ফলে মিথ্যা মামলা হচ্ছে শত শত নয়, হাজারে হাজার। যুদ্ধাপরাধীদের প্রকৃত বিচার তাদের কাছে কোন প্রসঙ্গই নয়। সেটি হলে একাত্তরে যারা যুদ্ধ করল সেই পাক-বাহিনীদের অফিসারদের তারা আদালতে তুলতো। অথচ তাদের কথা তারা এখন মুখেও আনে না। কারণ, পাকিস্তানী সেনা অফিসারগণ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নয়। তারা তো চায়, রাজনীতির ময়দান থেকে শত্রুর নির্মূল। ফলে অপরাধ-কর্ম নির্মূল বা অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া তাদের প্রায়োরিটি নয়। কারণ, অপরাধীরা জনগণের বা রাষ্ট্রের শত্রু হলেও আওয়ামী লীগের শত্রু নয়। তাই প্রশাসন হাজার হাজার জামাত-শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করছে এবং তাদের উপর শারিরীক ভাবে নির্যাতনও করছে, কিন্তু অপরাধের জোয়ার থেকে অপরাধীদের ধরে শাস্তি দিয়েছে সে নজির অতি সামান্যই। বরং তাদেরকে বিপুল ভাবে আশ্রয় দিচ্ছে নিজ দলে। কারণ, অপরাধী হলেও এসব সন্ত্রাসী দুর্বৃত্তদের দলীয় ক্যাডার হওয়ার সামর্থ প্রচুর। রাজপথে তারা বিরোধীদের অন্ততঃ লাশ বানাতে পারে। প্রধানমন্ত্রীরূপে শেখ হাসিনার মূল কাজ হল, নিজদলীয় এসব খুণ-সন্ত্রাসীদের গায়ে সামান্য আঁচড়টিও লাগতে না দেওয়া। এবং পুলিশের কাজ হল, নীরবে দাঁড়িয়ে সরকারদলীয়দের অপরাধকর্মগুলোকে দেখা এবং প্রয়োজনে জনগণের হাত থেকে প্রটেকশন দেয়া।

আওয়ামী লীগের কাছে এখন মূল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। তারা এ দুটো দলকেই নির্মূল বা দুর্বল করতে চায়। শেখ মুজিব নিজে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের অস্তিত্ব মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক দেশে এক নেতার নীতিতেই বিশ্বাসী। সে বিশ্বাস তিনি সযত্নে ছড়িয়েছিলেন তাঁর দলীয় নেতা-কর্মীদের মাঝে। তাই একদলীয় বাকশাল করে গণতন্ত্রকেই আস্তাকুঁড়ে ফেলেছিলেন। শেখ হাসিনাও মুজিবের পথ ধরে চলছেন। তবে একটু ভিন্ন ভাবে। একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার সাহস তাঁর নাই। সে সামর্থও নাই। কারণ এখন ১৯৭৪ সাল নয়। বিশ্বপরিস্থিতিও এখন ভিন্ন। তাছাড়া মুজিব আমলের ন্যায় ততটা সবল নয় তাঁর নিজের দল। দলীয় দুর্বলতার কারণে তাঁকে বাধ্য হতে হয়েছে অন্য ১৩টি দলের সাথে মিলে নির্বাচন করতে। তবে ষড়যন্ত্র, নির্যাতন ও মিথ্যা মামলা তৈরীর সামর্থ তার আছে। তাই শেখ হাসিনা একদলীয় বাকশালের বদলে আইন-আদালত ও প্রশাসনকে ব্যবহার করছেন বিরোধী দলের কোমর ভাঙ্গার কাজে। একদিকে বিএনপির বিরুদ্ধে মামলা আনছেন দুর্নীতির নামে, অপরদিকে ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধে মামলা আনছেন যুদ্ধাপরাধের নামে। অথচ একাত্তরে শুধু জামায়াতে ইসলামীই পাকিস্তানের পক্ষে নেয়নি। বরং বেশীর ভাগ লোক ছিল জামায়াতে ইসলামীর বাইরে। তারা ছিলেন মুসলিম লীগ, পিডিপি, নিজামে ইসলামী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, কৃষক-শ্রমিক

পার্টি, পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি(আব্দুল হকের)সহ বহু রাজনৈতিক দলের। অনেকেই ছিলেন অরাজনৈতিক সমাজকর্মী, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ও স্থানীয় পরিষদগুলীর নেতা। দেশের ক'জন আলেম বা মাদ্রাসার ক'জন ছাত্র সে সময় বাংলাদেশের পক্ষ নিয়েছিল? পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ নির্মানের প্রকল্পটি ছিল মূলতঃ দেশের বামপন্থি ও ভারতপন্থি সেকুলারিষ্টদের প্রকল্প। তারা একাত্তরে ভোট নেয় পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র নির্মানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। নির্বাচনে জেতার পর তারা এজেন্ডাই পাল্টিয়ে ফেলে। যারা ইসলামী চেতনা সমৃদ্ধ ছিলেন তারা সেদিন একটি মুসলিম দেশকে ভাঙ্গা হারাম মনে করত। যেমনটি আজও তারা ইরাক বা সূদানের খন্ডিত করার বিরোধী। তাদের সে সিদ্ধান্তের মধ্যে বাঙালীর স্বার্থহানী করার ভাবনা ছিল না। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ অবধি কালকে তারা বাঙালীর পরাধীনতাও ভাবেননি। এমনকি মুজিবও ভাবেননি। বরং শেখ মুজিব নিজেও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে কথা রেখেছিলেন দলীয় মেনিফেস্টোতে। নির্বাচনী জনসভাগুলোতে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বণিও দিয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কোন জনসভাতেও কোন ঘোষনা তিনি দেননি। পঞ্চাশের দশকে তিনি মন্ত্রীও হয়েছেন। মুজিব নিজে পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে ইয়াহিয়া খানের লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক স্বাক্ষর করে নির্বাচন করেছেন। একাত্তরের ২২শে মার্চেও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে আলোচনায় বসেছেন অখন্ড পাকিস্তানে সরকার গঠনের উপায় বের করার লক্ষ্যে। তাই পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়াকে কি অপরাধ বলা যায়? সেটি হলে সে অভিযোগে মুজিবেরও বিচার হওয়া উচিত।

এখন যুদ্ধাপরাধের নামে একাত্তরের পাকিস্তানপন্থিদের নির্মূলে শেখ হাসিনার এতটা উদ্যোগী হওয়ার মূল কারণ ভিন্ন। সেটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। সেটি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নির্মূলের লক্ষ্যে। পাকিস্থানপন্থি অন্যান্য দলগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় তারা আর এখন আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ নয়। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর অপরাধ, দলটি এখনও বেঁচে আছে। এবং রাজনৈতিক শক্তিও রাখে। ফলে সে আমলের পাকিস্তানপন্থি অনেকের সাথে আওয়ামী লীগ নেতাদের পারিবারীক আত্মীয়তা জমলেও তারা নির্যাতনে নেমেছে জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। তবে জামায়াতে ইসলামীর আরেক অপরাধ তারা একাত্তরে শুধু অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষেই ছিল না, তারা ইসলামপন্থিও। এবং ইসলামপন্থি হওয়াটাই এখন তাদের মূল অপরাধ। কারণ আওয়ামী লীগ ও তার ভারতপন্থি সেকুলার মিত্ররা আর যাই হোক ইসলামী দলের অস্তিত্ব মেনে নিতে রাজী নয়। শেখ মুজিবও নিজে রাজী ছিলেন না। ক্ষমতা হাতে পেয়েই সকল ইসলামীকে তিনি প্রথমে নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাই আওয়ামী লীগের দুষমনদের তালিকায় শুধু জামায়াতে ইসলামীই নয়, যারাই ইসলামের চেতনাধারি ও ইসলামের বিজয়ী আগ্রহী তারা সবাই। তাই জেল-জুলুম ও নির্যাতন নেমে আসছে হিজবুত তাহরীর, আহলে হাদীস আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী দলের কর্মীদের উপরও। এমনকি দাড়িটুপিধারী সাধারণ মুসল্লীরাও অতীতে তাদের লগি-বৈঠা থেকে রেহাই পায়নি।

তবে ইসলামপন্থিদের নির্মূল এখন আর শুধু আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের স্ট্রাটেজী নয়। এমন এক আগ্রাসী স্ট্রাটেজী নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা যুদ্ধে নেমেছে আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, আলজিরিয়া, সোমালিয়াসহ বহু মুসলিম দেশে। তাদের কাছে রাষ্ট্রের বুকে ইসলামের প্রতিষ্ঠার আওয়াজ উঠানোই অপরাধ। ইসলামের অবস্থান তারা মসজিদের জায়নামাজে মেনে নিতে রাজী, কিন্তু আদালত, প্রশাসন, শিক্ষা ও অর্থনীতিতে নয়। তালেবানদের মূল অপরাধ, ইসলামকে তারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। সেটি রুখতেই ৪০টি দেশের সৈন্য আফগানিস্তানে হাজির হয়েছে। এবং তাদের হাতে নিহত হয়েছে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ। তারা এখনও লাগাতর হত্যা-কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে সেদেশের নিরীহ গ্রামবাসীর উপর। বোমা ফেলছে বিয়ের মহফিলে। বোমা ফেলছে পাকিস্তানের ইসলামপন্থিদের মাথায়। মার্কিনীরা বহু লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে ইরাকে। বাংলাদেশেও আজ একই রূপ স্ট্রাটেজী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে আওয়ামী লীগ। ইসলামবিরোধী এমন বিশ্বজোড়া আগ্রাসনে মার্কিনীদের মিত্র শুধু ভারত ও ইসরাইলই নয়, আওয়ামী লীগও। ফলে তাদের হাতে আইনের শাসন পদদলিত হলেও মার্কিন প্রশাসন ও তার মিত্রদের মুখে তা নিয়ে সামান্যতম প্রতিবাদ নাই। এতে বরং প্রচন্ড খুশি প্রতিবেশী ভারত। ভারত তো চায় কাশ্মিরের মুসলমানদের উপর ভারত যেটি করছে তেমন একটি যুদ্ধ লাগাতর শুরু হোক বাংলাদেশের ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধে। কারণ বাংলাদেশে ইসলামের চেতনার উত্থানের ভয়ে ভারতীয় ততটাই বিচলিত যতটা বিচলিত কাশ্মীরে ও আফগানিস্তানে জিহাদের প্রচন্ডতায়। বাংলাদেশেও যে কোন সময় ইসলামের জোয়ার শুরু হতে পারে সে ভয়ে হারাম হয়ে গেছে তাদের ঘুম। সেটি বুঝা যায় ভারতীয় পত্র-পত্রিকা পড়লে। আওয়ামী লীগকে তারা ব্যবহার করছে সে জোয়ার রুখার যায়। তাই বাংলাদেশের পুলিশের কাজ হয়েছে ঘরে ঘরে হানা দিয়ে শুধু ইসলামপন্থি ছাত্রদের গ্রেফতার করা নয়, বরং জিহাদ বিষয়ক বই বাজেয়াপ্ত করাও। অথচ নামায-রোযার ন্যায় জিহাদ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। জীবনে নামায-রোযা না থাকলে যেমন কাউকে মুসলমান বলা যায় না, তেমনি মুসলমান যায় না জিহাদ না থাকলেও। জিহাদহীন মুসলমানকে নবীজী (সাঃ) মুনাফিক বলেছেন। নবীজীর আমলে জিহাদ করেননি এমন কোন সাহাবা পাওয়া যাবে কি? তাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে বাংলাদেশে আজ যা কিছু ঘটছে সেটি

কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত গ্লোবাল যুদ্ধের এটি এক অবিচ্ছিন্ন ঘটনা।

তাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার একটি বাহানা মাত্র। বিচার হবে কি হবে না সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, যেটি অনিবার্য সেটি হল বাংলাদেশের ইসলামপন্থিদের উপর লাগাতর নির্যাতন। দিন দিন সেটি বরং তীব্রতর ও বর্বরতর হবে। সে ব্যাপারে শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগের নিজেরও কিছু করার নাই। সে বরং ইসলাম-দুষমন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতের সামান্য ক্রীড়নক মাত্র। বল এখন মার্কিন-নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী জোটের হাতে। আর বাংলাদেশে সে জোটের পক্ষ থেকে ইসলামপন্থিদের দমনের ভার পেয়েছে ভারত। একাত্তরেও তেমনই একটি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। আজকের মত তখনও রাজনৈতীক খেলার নিয়ন্ত্রণ চলে গিয়েছিল দিল্লির দরবারে। সে সময় শেখ মুজিবেরও কিছু করার ছিল না। জেনারেল ইয়াহিয়া খান যুদ্ধ পরিহারের জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান ভাঙ্গার প্রশ্নে রেফারেন্ডামের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি সেটি নাকচ করে দিয়েছিলেন। সে আমলেও ভারতীয় স্ট্রাটেজীর বাস্তবায়ন ছাড়া আওয়ামী লীগের যেমন কোন এজেন্ডা ছিল না, আজও নাই। সে আমলে বেরুবাড়ী ভারতে হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আজ দেওয়া হচ্ছে তালপট্টি। দেওয়া হচ্ছে বন্দর। সে সময় ফারাক্কা বাঁধের উজানে গঙ্গার পানি উত্তোলনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। আজ দেওয়া হয়েছে টিপাইমুখ বাঁধের অধিকার। দেওয়া হচ্ছে ট্রানজিট। সে আমলে ইসলামী দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এবারও নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা হচ্ছে। মুজিব রক্ষিবাহিনী গড়েছিলেন। আর শেখ হাসিনা পুলিশ, র‌্যাব এবং আর্মিকেই রক্ষিবাহিনী বানিয়ে ছেড়েছে।

ভারতের এবারের আবদার, কাশ্মীরের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভারত যে যুদ্ধটি লড়ছে তেমন একটি প্রকান্ড যুদ্ধ শুরু হোক বাংলাদেশের ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধে। তাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে দেশে জুড়ে যে রাজনৈতিক উত্তেজনা ও বিষ ছিটানো হয়েছে সেটি থামাবার পথ শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের হাতে নেই। সে ইচ্ছাও নেই। ইচ্ছা করেই পথ বন্ধ করা হয়েছে শান্তিপূর্ণ ভাবে দেশে ইসলামের বিজয় আনার। ফলে প্রশাসনিক দুর্বৃত্তদের আয়োজিত নির্বাচনে জিতে যারা এমপি বা মন্ত্রি হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশে ইসলামের বিজয়ের স্বপ্ন দেখতেন তাদের এখন স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার দিন। ইসলামের বিপক্ষ যে শয়তানি শক্তি নবীজী (সাঃ)র ন্যায় মানব-ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ শান্তিপূর্ণ ভাবে হতে দেয়নি সে পক্ষটি আজও হতে দিবে -সেটি কি আশা করা যায়? প্রতিবেশী ভারত সেটি মেনে নিবে সেটিই বা কীরূপে বিশ্বাস করা যায়? ইসলামের বিজয় অর্জন করতে হয় অর্থ, রক্ত, শ্রম, ছবর ও মেধার বিনিময়ে। আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে কোরবানী পেশ ছাড়া ভিন্ন কোন পথ রাখাই হয়নি। ঈমানদারীর পরিক্ষা তো হয় এ পথেই। নবীজী (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)কেও সে অভিন্ন পথেই অগ্রসর হতে হয়েছে। প্রতি যুগে ঈমানদারীর পরীক্ষা তো এ পথেই হয়, নিছক ভোটদানে নয়। ঈমানদারদের জন্য সে পরীক্ষাটিই বাংলাদেশে চরম ভাবে শুরু হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হল, বাংলাদেশের ইসলামপন্থিরা এ পরীক্ষায় কীভাবে অংশ নেয়। আত্মসমর্পণ এখানে কোন পলিসি নয়, ভীরুতা বা নীরবতা হতে পারে না কোন স্ট্রাটেজী। আত্মসমর্পণ, ভীরুতা ও নীরবতায় সেটি অনিবার্য করে সেটি আল্লাহর আযাব —সেটি যেমন এ দুনিয়ায়, তেমনি আখেরাতে। ফলে বাংলাদেশের ইসলামপন্থিগণ এখন এক চরম পরীক্ষার মুখোমুখি। তবে কথা হল, কঠিন পরীক্ষা ছাড়া কি বড় রকমের কোন প্রমোশনও কি আশা করা যায়? আর ঈমানদারের জীবনে সে প্রমোশনটি তো আসে নিয়ামত ভরা জান্নাত প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। পরিস্থিতির মূল্যায়নে বাংলাদেশের ইসলামপন্থিদের তাই বোধোদয় হওয়া উচিত।